বুলেটিন নং: ২২
বর্ষ ৮ ॥ সংখ্যা ৩
প্রকাশ কাল: ১২ নভেম্বর ২০০২
শুভেচ্ছা মূল্য: ৮ ৫ ॥ $2

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

জেএসএস এর ভুলের মাশুল আর কত কাল?

॥ সত্যদর্শী ॥

জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা গত ৫ নভেম্বর খাগড়াছড়িতে তার পার্টির ৭ম কংগ্রেস উদ্বোধনকালে বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন যে, পার্বত্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করা ছিল একটি বড় ধরনের ভুল। (৬ নভেম্বরের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা দেখুন)। চুক্তি স্বাক্ষরের পাঁচ বছরের মাথায় এসে তিনি তার এই ভুল স্বীকার করলেন। এই পাঁচ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক কিছু ঘটে গেছে। চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পুরোপুরি বদলে যায়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং পরে ইউপিডিএফ চুক্তির সমালোচনা করলে তাদের ওপর শুরু হয় সরকার ও জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক নির্যাতন। এই নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। শুধু এটুকু বলা এখানে যথেষ্ট হবে যে, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুনভাবে আর আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য নবগঠিত ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলো তাদের মধ্যে এক "পবিত্র ঐক্য" গঠন করে। ইউপিডিএফ-কে গলা টিপে হত্যা করার জন্য এমন কিছু নেই যা করা হয়নি। কিন্তু জনগণের সমর্থনপুষ্ট ও সঠিক নীতি আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করা তো দূরের কথা। বরং নতুন সময়ের এই পার্টি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে খুব দ্রুত শক্তি অর্জন করে।

যাই হোক, স্বাধিকারের পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, চুক্তিকে ঘিরে সেই সময় euphoria বা উচ্চাশা সৃষ্টি করা হয়েছিল। সরকার ও জনসংহতি সমিতি তাদের স্বাক্ষরিত চুক্তিকে "শান্তিচুক্তি" হিসেবে আখ্যায়িত করে। আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা তখন মহা উল্লসিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকামী জনগণসহ দেশের ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা রাতদিন বিরামহীনভাবে শান্তির জারিগান গাইতে থাকলেন। কিন্তু এতকিছু সত্বেও চুক্তি সম্পর্কে মোহ ভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। মেঘ যেমন সূর্যকে চিরকাল ঢেকে রাখতে পারে না, তেমনি কোন প্রকার বিভ্রান্তি ও মিথ্যার অপপ্রচারও সত্যকে সব সময় আড়াল করতে পারে না। সত্য সূর্যের মতো চিরভাস্বর। একদিন সত্য প্রকাশ পাবেই এবং সবাইকে একদিন না একদিন সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। দেরীতে হলেও সত্য স্বীকার করার জন্য সন্তু লারমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সত্য স্বীকার করার জন্যও সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভুল স্বীকার করা এক জিনিস, আর ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে জন্য নিজেকে সংশোধন করা অন্য জিনিস। কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়। মহাপুরুষরাও ভুল করে থাকেন। কিন্তু কথা হলো, সেই খাঁটি মানুষ যে ভুলকে চিহ্নিত করে নিজেকে তাড়াতাড়ি সংশোধন করতে পারে। কাজেই জনসংহতি সমিতির সভাপতি যদি আন্তরিকতার সাথে নিজের ভুল স্বীকার করে থাকেন, তাহলে তার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে নিজেকে সংশোধন করা ও ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়ানো।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, জেএসএস এর উক্ত কংগ্রেসে গৃহীত ৩৩ দফার বিশাল প্রস্তাব দেখে মনে হয় না যে সন্তু বাবুরা নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিয়েছেন অথবা সংশোধন করতে রাজী আছেন। ঐ ৩৩ দফার ১৭ নম্বর দফায় ইউপিডিএফ-কে "কঠোরভাবে মোকবিলা ও নির্মূল" করার কথা বলা হয়েছে। জেএসএস-এর এই প্রস্তাব গ্রহণ একদিকে তা যেমন তাদের কান্ডজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, অপরদিকে তা হচ্ছে তাদের চরম ফ্যাসিস্ট মানসিকতারই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। জেএসএস এর উক্ত প্রস্তাব ও বিভিন্ন সময়ে ইউপিডিএফ সম্পর্কে দেয়া সন্তু লারমার উক্তি ইতালির ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী ও চীনের প্রতিক্রিয়াশীলতার মূর্ত প্রতীক চিয়াং কাইশেকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জেএসএস নেতৃবৃন্দের মনে রাখা উচিত ইতিহাসে এইসব ফ্যাসিস্টদের কি পরিণতি ঘটেছে। তাদের আরো মনে রাখা উচিত সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনকিছুই ঠিকতে পারে না। জেএসএস ইউপিডিএফ সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেছে তা সত্য, ন্যায় ও যুক্তিযুক্ততার ওপর প্রতিষ্ঠিত তো নয়ই, উপরন্তু তা হচ্ছে দায়িত্বজ্ঞান ও কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত। তাদের এই নীতি কেবলমাত্র তাদেরকেই লাভবান করবে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আধিপত্য বজায় রাখতে চায় ও যারা শাসকগোষ্ঠির তাবেদার হয়ে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচতে চায়।

রাজনৈতিক ভুলের চাইতে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কোন কিছু আর হতে পারে না। জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কোন পার্টি বা নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভুলের মাশুল দিতে হয় সমগ্র জনগণকে, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মকেও। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভুলের মাশুল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অতীতে বহুবার দিতে হয়েছে এবং এখনও দিতে হচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষর করাকে একটি বড় ভুল বলে স্বীকার করে নিলে, এই চুক্তিকে যারা সমালোচনা করছে তাদের ওপর দমন পীড়ন চালানোর সামান্যতম অজুহাতও আর থাকতে পারে না। বস্তুত চুক্তির পর থেকে তিন সংগঠন ও ইউপিডিএফ এর ওপর ফ্যাসিস্ট কায়দায় যে বর্বর দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তার কোনরূপ ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত হাজির করা হয়নি। জেএসএস নেতাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন

২য় পাতায় দেখুন

কাউখালির পোড়াপাড়া ও মুভাছড়িতে সেনা তল্লাশি

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ২১ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে নয়টার দিকে কাউখালি ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি সেনাদল ঘাগড়া ইউনিয়নের পোড়াপাড়া ও মুবাছড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। এ সময় গ্রামের লোকজন হয়রানির শিকার হয়। সেনারা ৩ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে কোন কারণ ছাড়াই বেদম মারধর করে।

এরা হলেন শুক্রমনি চাকমা (৩৭) পিতা বীর কুমার চাকমা গ্রাম উগলছড়ি, সুরেশ কুমার চাকমা (৪০) পিতা মৃত ইন্দ্র চাকমা গ্রাম পোড়া পাড়া ও বিমল কৃষ্ণ চাকমা (২৫) পিতা বৃষধন চাকমা গ্রাম পোড়াপাড়া।

এলাকার মুরুব্বীরা ঘটনার প্রতিকার পাওয়ার আশায় সাবজোন কমান্ডার নাইদুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ কিংবা দোষী সেনা জোয়ানদের শাস্তি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান।

বর্তমানে প্রায় সময় রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালি, নান্যাচর, কুতুকছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় সেনারা তথাকথিত তল্লাশী অভিযান চালাচ্ছে। এতে সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। সেনাদের এসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছে জনসংহতি সমিতি। অনেক সময় তারা নিজেরাই সেনা পোষাক পরে অপারেশনে যায়। আবার অনেক সময় ইউপিডিএফ-এর সদস্যদের বাড়িঘর দেখিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরাও মাঝে মধ্যে ইউপিডিএফ-এর সদস্য ও সমর্থকদের বাড়িতে হানা দিয়ে থাকে। একদিকে সেনাবাহিনীর অপারেশন ও অন্যদিকে জেএসএস-এর সশস্ত্র-সদস্যদের অত্যাচার উৎপীড়ন - জনগণ এখন চরমভাবে অতিষ্ঠ।

দিঘীনালার বাবুছড়ায় ৪ জন আটক

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ১২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশ দিঘীনালার বাবুছড়ায় তথাকথিত যৌথ অভিযান চালিয়ে একজন ইউপিডিএফ কর্মিসহ ৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কিংবা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। আটককৃতরা হলেন প্রিয় লাল চাকমা, তরুণ জ্যোতি চাকমা, সবিনয় চাকমা ও বিমল কান্তি চাকমা। পরে এলাকাবাসীর চাপের ফলে সেনারা তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে এক ব্যক্তি গুম

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ১২ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি শহর থেকে প্রিয়ময় চাকমা নামে এক কলেজ ছাত্রকে দিন দুপুরে রাঙ্গামাটি কলেজ থেকে জেএসএস সমর্থিত ছাত্ররা অপহরণ করে। তার বাড়ি খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায়। তার বাবার নাম রমণী মোহন চাকমা। তার পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদের ধারণা জেএসএস এর সদস্যরা তাকে গুম করেছে। কারণ সে ইউপিডিএফ এর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক।

তার পরিবারের পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটিতে জেএসএস এর উর্ধ্বতন নেতাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাদেরকে প্রথম দিকে ছেড়ে দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়। সে "জেএসএস ও জাতি বিরোধী" কাজে জড়িত নয় এই মর্মে একটি সনদপত্র মাটিরাঙ্গার জেএসএস এর অফিস থেকে নিয়ে আসার জন্যও তাদেরকে বলা হয়। সেই মোতাবেক তার পরিবারের পক্ষ থেকে মাটিরাঙ্গায় জেএসএস সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। সন্তু লারমা সমর্থিত "পিসিপি" সাধারণ সম্পাদক লিখে দেন যে, সে জাতিবিরোধী ও জেএসএস বিরোধী কোন কাজে আর জড়িত নয়।

২য় পাতায় দেখুন

জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যদের অত্যাচারে বর্তমানে অনেক গ্রাম শুন্য, অনেকে ঘরছাড়া

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে পেরাছড়ার গিরিফুল এলাকা। সেখান থেকে কিছুদূরে গুলকানা পাড়া ও ফাউলুক্যা পাড়া। বর্তমানে এ গ্রাম দুটি জনশুন্য।

জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যদের ভয়ভীতি ও অত্যাচারের কারণে দুই গ্রামের প্রায় ৭০টি পরিবার গত বছর ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাদেরকে জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা দুইটি অপশন দেয়: হয় আড়াই লাখ টাকা দেয়া অথবা গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া। নিরীহ গরীব গ্রামবাসীরা উক্ত আড়াই লাখ টাকা জোগার করতে ব্যর্থ হলে বাপদাদার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন।

উচ্ছেদ হওয়া এই দুই গ্রামের লোকজন বর্তমানে পেরাছড়া এলাকার মধ্যে দয়ারাম পাড়া, নীলকান্ত পাড়া ও ১২ নং যৌথ খামারে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে সেখানেও তাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। কখন জেএসএস-এর সদস্যরা এসে হানা দেয় এই ভয়ে। তাদের এই আশংকা অমূলক নয়। এ বছর জুলাই মাসের ১৫ তারিখ সকাল ৬টার দিকে একদল জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্য নীলকান্ত পাড়ায় হানা দেয়। তারা পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বিমল কান্তি চাকমাসহ আরো কয়েকজনকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাদেরকে জনশুন্য গুলকানা পাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার সময় জেএসএস সদস্যরা ২৫ জনের খাবার রেঁধে দেয়ার জন্যও গ্রামবাসীদের নির্দেশ দিয়ে যায়। জেএসএস সদস্যরা তাদের ধার্য করা আড়াই লাখ টাকা কেন দেয়া হয়নি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে। শেষ পর্যন্ত তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে। সে টাকাও দেয়া হয়নি। ঐদিনই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এর ৮/১০ দিন পর লুসিদ নাম দিয়ে জেএসএস এর এক সদস্য বিমল কান্তি মেম্বারকে চিঠি দেয় মহাজনপাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবে দেখা করার জন্য। তিনি নীহার বিন্দু চাকমা, প্রিয় লাল চাকমা ও অপর একজনকে নিয়ে সূর্যশিখা ক্লাবে যান। তাদের সাথে জেএসএস-এর পক্ষ থেকে কথা বলেন লুসিদ ও সুশীল। জেএসএস-এর সদস্যরা তাদেরকে বিভিন্ন হুমকি ও ভয়ভীতি দেখান।

উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে তিন জন সশস্ত্র জেএসএস সদস্য নিহত হলে এর প্রতিশোধ নিতে জেএসএস সদস্যরা ফাউলুক্যা পাড়া ও গুলকানা পাড়ায় হামলা ও লুটপাট চালায়, লোকজনকে মারধর করে ও শশী কুমার চাকমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীদের অত্যাচার থেকে ৫ বছরের শিশুও বাদ যায়নি। জেএসএস সদস্য ইন্দু ওরফে বিজিমুয়্য পরে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আড়াই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। জেএসএস সদস্যদের এই চরম অত্যাচার ও জোরজুলুমের প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা সে সময় খাগড়াছড়ি সদরে মিছিল বের করে।

বান্দরবানে এক বাঙালি হত্যার জের ধরে মারমা গ্রামে হামলা, লুটপাট

স্বাধিকার ডেস্ক ॥ বান্দরবান জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে রাজভিলা গ্রামে একজন বাঙালি খুন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালানো হয়েছে। গত ১০ অক্টোবর অগ্যজাই কার্বারী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা ১১টি বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা লুটপাট ও ঘরবাড়ি তছনছ করে দেয়। হামলাকারীরা নারী, শিশু ও বয়স্কসহ কমপক্ষে ৪০ জন গ্রামবাসীর ওপর নির্যাতন চালায়। মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগও রয়েছে।

পত্রিকার রিপোর্টে জানা যায়, রাজভিলা ইউনিয়নের অগ্যজাই কার্বারী পাড়ায় বিধবা মহিলা অংম্রাচিং মারমার কাছে ঘটনার আগের দিন সকালে দাদনের ৫০০ টাকা চাইতে যায় পাশের গ্রামের শামসুল। টাকা না পেয়ে মহিলার কাছ থেকে সে জোর করে একটি গরু নিয়ে যায় এবং বিকেলে আবার এসে টাকার জন্য ঝগড়া করে। এই সময় ঐ বিধবা মহিলার আত্মীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে দাদন ব্যবসায়ী শামসুলকে হত্যা করে এবং তার লাশ সেগুন বাগানের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। রাতে এ খবর পেয়ে নিহত শামসুল আলমের দুধপুকুরিয়া গ্রামের একদল দুর্বৃত্ত লাঠিসোটা, দা, এবং বন্দুক নিয়ে ঐ মারমা পাড়ায় হামলা চালায়। হামলায় ১১টি বাড়িঘর ও একটি রাইস মিল সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। হামলাকারীরা দা ও অস্ত্রের মুখে রাজভিলা এলাকার প্রায় ১০০টি পাহাড়ি বাড়িতে ভাংচুর ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার □ ১২ নভেম্বর ২০০২ □ বুলেটিন নং ২২

বর্তমান জোট সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কীত নীতি

গত অক্টোবরে ক্ষমতাসীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা এখন তাদের এক বছরের "সাফল্যের" হিসাব কষতে ও জনগণের কাছে তার ফিরিস্তি দিতে মহা ব্যস্ত। অন্যদিকে সেনাবাহিনী "অপারেশন ক্লিন হার্ট" নাম দিয়ে সারা দেশব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। সেনাবাহিনীর এই অপারেশনের মাধ্যমে যে বিষয়টি আরো একবার স্পষ্ট হয়েছে তা হলো সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। বিএনপি সরকার সন্ত্রাস নামক দৈত্যটি তাড়াতে চাইছে, অথচ তার দলটিই সন্ত্রাসের ওপর ভর করে টিকে আছে। শাসকগোষ্ঠির অন্য দল আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। সন্ত্রাসী হিসেবে যারা গ্রেফতার হয়েছে তারা হয় এই দুটি দলের নেতা কর্মি অথবা তাদের আশ্রিত দাগি সন্ত্রাসী। কাজেই যতদিন সন্ত্রাসী ও শাসক গোষ্ঠির রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে symbiotic relationship বিদ্যামান থাকবে ততদিন সেনাবাহিনীর এই ধরনের অপারেশন সমাজ থেকে সন্ত্রাসকে কখনোই নির্মূল করতে সক্ষম হবে না।

যাই হোক, নতুন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত এক বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। বর্তমান সরকারও পূর্বের সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে। সরকার তার এই নীল নকসা বাস্তবায়নে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে সন্তু লারমা এন্ড কোং-কে। সেজন্য নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই তিন জেলা পরিষদে পূর্বতন সরকারের মনোনীত লোকজনদের সরিয়ে নিজের দলীয় লোকদের বসিয়ে দিলেও, আঞ্চলিক পরিষদে জেএসএস-কে বহাল তবিয়তে রেখেছে। অথচ, এই বিএনপি সরকারই চরম উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে চুক্তির বিরোধীতা করেছিল। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, শাসক গোষ্ঠির রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি-জামাত জোট সরকারও পূর্বের সরকারের মতো সন্তু লারমার মধ্যে এমন এক দালালকে আবিস্কার করেছে, যাকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট দিয়ে ব্যবহার করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কার্যকরভাবে রোধ করা যায়। বিষয়টাকে অন্যভাবেও দেখা যায়। সন্তু লারমা ও তার দল কোন না কোনভাবে সরকারের স্বার্থ রক্ষা করে দিতে না পারলে সরকার তাদেরকে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বসিয়ে রাখবে কোন দুঃখে? আর অন্যদিকে সরকারের কৃপা ছাড়া নিজের পার্টির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সন্তু বাবুর পক্ষে যে অসম্ভব তা আজ সবার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। গত নির্বাচনে গোপনে বিএনপির সাথে সন্তু লারমার মৌখিক চুক্তি ও নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার হম্বিতম্বি সত্বেও বিএনপি প্রার্থীদের সমর্থন দান জেএসএস এর সরকার-নির্ভরতাকেই প্রমাণ করেছে।

কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে status quo বজায় রাখার সরকারী নীতির বিপরীতে মুক্তিকামী জনগণের বর্তমান সময়ে যা করা জরুরী তা হলো প্রথমত নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন জোরদার করা এবং দ্বিতীয়ত চুক্তি ও আত্মসমর্পনের পর জেএসএস-এর মধ্যে যে সীমিত শক্তি রয়েছে তা যাতে ভ্রাতৃঘাতি হানাহানিতে ব্যবহৃত না হয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যবহার করা হয় তার জন্য জেএসএস নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা একমাত্র জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। আর জনগণ এবং একমত্র জনগণই হলেন এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রধান শক্তি।

জেএসএস এর ভুলের মাশুল আর কত কাল?

১ম পাতার পর

ইউপিডিএফ এর ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালানো হচ্ছে? কেন প্রকাশ্য দিবালোকে প্রদীপ লাল কুসুম প্রিয়কে খুন করা হয়েছে? কেন চুক্তির পর পর ইউপিডিএফ-এর কর্মি ও সমর্থকদেরকে ধরে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে? সর্বোপরি, ইউপিডিএফ এর ঐক্যের আহ্বান সত্বেও কেন এবং কার স্বার্থে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে জিইয়ে রাখা হয়েছে? জেএসএস নেতৃবৃন্দ এই সব প্রশ্নের কি জবাব দেবেন? আজ পর্যন্ত তারা ব্যাখ্যা করে বলতে পারেননি ইউপিডিএফ ও তিন সংগঠনের কি অপরাধ, যার জন্য তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করার নির্দেশ দিতে হবে।

ইউপিডিএফ বরাবরই বলে আসছে যে ইউপিডিএফ যেহেতু জনগণের পার্টি সেহেতু এই পার্টির ভুল ধরিয়ে দেয়ার, পার্টির নীতি আদর্শ কৌশল ও কর্মসূচীর সমালোচনা করার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপর হলো, জেএসএস নেতৃত্ব আজ পর্যন্ত ইউপিডিএফ এর নীতি কৌশল ও কর্মসূচী সমালোচনার দিকে যায়নি। প্রথম থেকেই তারা শারীরিক আক্রমণ চালিয়ে নির্মূলীকরণর দিকে এগিয়েছে। কিন্তু তার ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জনগণ জেএসএস নেতৃত্বের ভুলের মাশুল আর কতকাল দেবেন? আর কতকাল জনগণ জেএসএস এর ভুল নেতৃত্বের জিম্মি হয়ে থাকবেন? সন্তু লারমা চুক্তি স্বাক্ষর করাকে ভুল বলে স্বীকার করেছেন, অত্যন্ত ভালো কথা। কিন্তু তিনি কবে স্বীকার করবেন, ইউপিডিএফ এর ওপর বিনাকারণে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখাও একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল? বার বার আহ্বান সত্বেও ন্যুনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ইউপিডিএফ এর সাথে ঐক্য না করার ভুল স্বীকার করতে আর কত সময় লাগবে জেএসএস সভাপতির?

প্রথমেই বলা হয়েছে ভুল স্বীকার করা হচ্ছে প্রাথমিক পদক্ষেপ। পরবর্তী পদক্ষেপ হলো নিজেদের পার্টি নীতি কৌশল ও কর্মসূচীর সংশোধন করা। আমরা আশা করি, জেএসএস নেতৃত্বের পুরোপুরি শুভবুদ্ধির উদয় হবে, তারা অচিরেই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করবেন। এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, আত্মসমর্পনের পর কোন পার্টিই আর জনগণের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে পারে না। মানব সমাজের পুরো ইতিহাসে কোন দেশে এর নজীর নেই। জেএসএস-ও যে তার ব্যতিক্রম হবে না তা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। কিন্তু তা সত্বেও ইউপিডিএফ জেএসএস এর অবদানকে কখনো খাটো করে দেখেনি। জেএসএস নেতৃত্বের ভুলের যেমন সমালোচনা করেছে, তেমনি যেখানে স্বীকৃতি দেয়ার দরকার সেখানে অকুণ্ঠভাবে তার স্বীকৃতি দিতে ইউপিডিএফ কার্পন্য করেনি। ইউপিডিএফ ভবিষ্যতের আন্দোলনেও জেএসএস-কে সাথে নিতে চায়।

চুক্তিকে ঘিরেই জেএসএস এর রাজনীতি। চুক্তির পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিই হলো জেএসএস এর সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্মসূচী। তাই যদি হয়, তাহলে মহাসমারোহে নিজেদের স্বাক্ষর করা চুক্তিকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করার পর জেএসএস এর রাজনীতির যোগবিয়োগের ফলাফল কি দাঁড়ালো? এই ভুল স্বীকারের মাধ্যমে কি জেএসএস এর সমস্ত আন্দোলনের ফলাফল ও রাজনীতি শুন্য হয়ে গেল না? এই ভুল স্বীকারের পর জেএসএস এর রাজনীতি বলতে আর কিছু থাকে বলে মনে হয় না। তাহলে এখন জেএসএস এর পরবর্তী কর্মসূচী কি হবে? ভুল চুক্তির বাস্তবায়ন না কি অন্য কিছু? জেএসএস নেতৃত্ব এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে কিছু বলেননি।

আরো একটি সত্য কথা জেএসএস নেতাদের স্বীকার করা উচিত। আর তা হলো, চুক্তির মাধ্যমে জনগণের আন্দোলনকে সরকারের কাছে বন্ধক দেয়া হয়েছে। জনগণ অনেক রক্ত দেয়ার পরও সেই আন্দোলনকে এখনো পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। আর কত রক্ত আর ভোগান্তি হলে তা উদ্ধার হবে? জেএসএস নেতৃবৃন্দ বলবেন কি?

শেষ করার আগে আরো একটি কথা। শুধু ভুল স্বীকার যথেষ্ট নয়। চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আন্দোলনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ও জনগণকে যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তার জন্য জনগণের কাছে জেএসএস নেতৃত্বের ক্ষমা চাওয়া উচিত। □

রাঙ্গামাটিতে এক ব্যক্তি গুম

১ম পাতার পর

সুতরাং তাকে মুক্তি দেয়া হোক। কিন্তু এভাবে চিঠি নিয়ে যাওয়ার পরও জেএসএস প্রিয়ময় চাকমাকে মুক্তি দেয়নি। এরপর জেএসএস এর রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি তাদেরকে লংগদু ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আমাকে কেন? তারা ধরে নিয়ে আসবে। আমি এসবের কি জানি? আমি কিছুই জানি না। আমাকে তারা (জেএসএস) মেরে ফেলবে নাকি?" লংগদু চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এ কথা শোনার পর ফিরে এসে তারা আবার জেএসএস-এর কেন্দ্রীয় অফিসে যোগাযোগ করেন। এবার জেএসএস নেতারা আর প্রিয়ময়কে খোঁজ না করার জন্য তাদেরকে পরামর্শ দেন। তার গুম হওয়া ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য না করার জন্যও জেএসএস নেতারা চাপ দেন। সে কারণে বিষয়টি এতদিন প্রকাশ পায় নি।

প্রিয়ময় চাকমা রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের একজন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। মাটিরাঙ্গায় পড়ার সময় সে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল। ইউপিডিএফ এর পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রতি সে খোলাখুলি তার সমর্থন ব্যক্ত করে। এ কারণে জেএসএস সদস্যরা তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে থাকতে পারে।

দিঘীনালায় জেএসএস কর্তৃক ১ ব্যক্তি অপহৃত, পরে মুক্তি

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ২৭ সেপ্টেম্বর জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা রাজীব চাকমার নেতৃত্বে দিঘীনালা স্টেশন থেকে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে। তার নাম মন্টু বিকাশ চাকমা (২৬) পিতা ইংগে ধন চাকমা । বর্তমানে সে বাবুছড়ার কিয়াংঘাটে থাকলেও তার স্থায়ী ঠিকানা হলো খাগড়াছড়ির মুনিগ্রামে।

জেএসএস সদস্যরা তাকে জোর করে গাড়িতে করে চংড়াছড়িতে নিয়ে যায় এবং ১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে বলে জানিয়ে দেয়। পরে জনগণের ব্যাপক চাপের মুখে ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিতে রাজী হয়। এই মুক্তিপণের টাকার প্রথম কিস্তি ৫০০০ টাকা দেয়া হলে অপহরণকারীরা গত ৫ অক্টোবর তাকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য, মন্টু বিকাশ চাকমা সাবেক জেএসএস সদস্য, তবে সে চুক্তির আগে জেএসএস-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে।

দিঘীনালায় অপহরণ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৫ অক্টোবর দিঘীনালার বাবুছড়ায় এক সেটলার এক জুম্ম কিশোরীকে ধর্ষণের অপচেষ্টা চালায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐদিন বাবুছড়া ক্যাম্পের পূর্বদিকে গোবিন্দ কার্বারী পাড়ার মনিকা চাকমা (১৫) পিতা শুক্রসেন চাকমা স্কুলে প্রাইভেট পড়তে আসছিল। এ সময় ক্যাম্পের পাশে এক সেটলার বাঙালি তাকে অতর্কিতে ঝাপতে ধরে ধর্ষণের অপচেষ্টা চালায়। মনিকা নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য অনেক্ষণ তার সাথে ধস্তাধস্তি করে। পরে উপায়ান্তর না দেখে সে ঐ সেটলারের হাতের আঙুলে কামড় দিলে সেটলারটি তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর মনিকা পার্শ্ববর্তী আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা দিলে সেনারা এর প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপরাগতা প্রকাশ করে। পরে অপরাধী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবিতে বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৮ অক্টোবর দিঘীনালায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেয়। তিন দিনের মধ্যে দোষী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদানের আল্টিমেটাম দেয়া হয়।

ছাত্রছাত্রীরা যাতে মিছিল করতে না পারে তার জন্য আর্মিরা বাঁধা প্রদান করে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা সে বাঁধা উপেক্ষা করে মিছিলে শরীক হয়।

আর্মি ও প্রশাসন বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। অপরাধী ব্যক্তিকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি। গত ১৪ অক্টোবর একই দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতীক অনশন পালন করে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি কতদূর?

সুখেশ্বর ত্রিপুরা

আগামী ডিসেম্বরের ২ তারিখ পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ৫ বছর পূর্ণ হবে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জনসংহতি সমিতির সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি মোতাবেক শান্তিবাহিনী ও জেএসএস এর সদস্যরা সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করে। এর বিনিময়ে তারা সরকারের কাছ থেকে প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকা পান। সন্তু লারমাসহ জেএসএস এর উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যপদ লাভ করেন।

বলা হয়েছিল সরকার ও জেএসএস এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই চুক্তিকে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের ন্যুনতম অধিকারের সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছর যেতে না যেতেই সবার কাছে পরিষ্কার হয় যে এই চুক্তি ছিল একটি ভাওতাবাজি। জেএসএস সরকারের বিরুদ্ধে বহুবার প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তির মাধ্যমে জেএসএস-কে ঠকিয়েছে। তবে জেএসএস সভাপতি সন্তু লারমা এখন স্বীকার করছেন যে, চুক্তি করাটা ছিল একটি বড় ভুল।

জেএসএস সরকারের সাথে যে চুক্তি করেছে তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়নি। জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা আজ এমন এক সত্য এর পক্ষে যুক্তি তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা চুক্তির এক পক্ষ - এবং দুর্বল পক্ষ - অর্থাৎ জনসংহতি সমিতি বহু আগেই স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে চুক্তি সম্পাদন ও মহা উৎসবে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আত্মসমর্পনের পরও কেন পার্বত্য চট্রগামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো না? শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কারণ চুক্তির মাধ্যমে জনগণের মৌলিক দাবিগুলোর কোনটাই পূরণ হয়নি। প্রতারণা করে, ঠকিয়ে জনগণের কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো দু'টি চুক্তি ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর একটি ১৯৮৪ সালে জনসংহতি সমিতির প্রীতি বা বাদি গ্রুপের সাথে এবং অপরটি ১৯৮৯ সালে সরকার-মনোনীত তথাকথিত ট্রেডিশনাল নেতাদের সাথে। এই দুটি চুক্তিও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়।

বর্তমান বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ১৯৯৭ সালের চুক্তির বিরোধীতা করেছিল। বিএনপি এর প্রতিবাদে তথাকথিত লংমার্চও আয়োজন করে। তাদের এই বিরোধীতা ছিল চরম উগ্রজাতীয়তাবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তবে এ কথা সত্য যে, আওয়ামী লীগের জায়গায় যদি সে সময় বিএনপি ক্ষমতায় থাকতো তাহলেও চুক্তি স্বাক্ষর হতো। পরিস্থিতি তখন যেভাবে গড়িয়েছে তাতে চুক্তি ছিল অবধারিত।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার এক বছর পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। তবে শুরুতেই বিগত সরকারের সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনসংহতি সমিতি বিগত সংসদ নির্বাচনে বয়কট ও প্রতিহতের ডাক দিলেও গোপনে রাঙ্গামাটিতে বিএনপি-জামাত জোট প্রার্থী মনিস্বপন দেওয়ানকে সমর্থন দেয়। এই ধরনের নীতিহীন গর্হিত কাজ একমাত্র জনসংহতি সমিতির মতো অধঃপতিত নেতৃত্বের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

অতীতে বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের ওপর চরম দমন পীড়ন চালিয়েছে। তাদের আমলেই ১৯৮০ সালে প্রথম গণহত্যা কাউখালির কলমপতিতে সংঘটিত হয়। এরপর খালেদা জিয়ার সময় ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে লোগাং ও নানিয়াচর গণহত্যা সংঘটিত হয়। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিএনপি সরকারের পূর্বের নীতি যদি পরিবর্তন না হয়, এবং জনগণের ন্যায্য দাবি পূরণের ভিত্তিতে যদি সমস্যার সমাধান করা না হয়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি সুদূর পরাহত। এক্ষেত্রে জনগণের একমাত্র করণীয় হচ্ছে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। □

ড. মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী

ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসঙ্গে

কিছুদিন হলো পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নামক পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ছাত্রদের একটি ছাত্র সংগঠন সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করাসহ ৫ দফার একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। ঐদিনই তারা উক্ত ৫ দফার সমর্থনে মুক্তাঙ্গনে একটি সমাবেশও করেছে। তাদের ৫ দফার মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসমূহের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের অধিকার নিশ্চিত করা, জাতিসত্তার প্রতি অবমাননাকর যে কোন বক্তব্য পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া, পাহাড়ি জাতিসত্তার সঠিক ও সংগ্রামী রাজনৈতিক ইতিহাস সংবলিত পাঠ্যপুস্তক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুল ও কলেজে অন্তর্ভুক্ত করা, বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত সার্বিক তথ্য সংবলিত পরিচিতিমূলক পুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার প্রধান দেশ বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দাবিসমূহকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি, বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের বোধ ও উপলব্ধির বিষয়টিকে অত্যন্ত ইতিবাচক চিন্তা বলেও মনে করছি। কেন তা মনে করছি সে প্রসঙ্গই এই নিবন্ধে তুলে ধরছি। বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতল ভূমিতে ৩০টির অধিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি বসবাস করছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীতে এদের সংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ জন দেখানো হয়েছে। ঐ আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.১৩% তারা। তবে সকলেই মনে করছেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর প্রকৃত জনসংখ্যা ২০ লাখের অধিক হবে। গত ১১ বছরে এই সংখ্যাটি বেড়ে ২৫ থেকে ৩০ লাখে উন্নীত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যানে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির মধ্যে চাকমা ও সাঁওতাল জনসংখ্যা সর্বাধিক (যথাক্রমে ২,২৫,৮৫৮ এবং ২,০২,১৬২ জন) দেখানো হয়েছে। সবচাইতে ছোট স্মো জাতিগোষ্ঠির জনসংখ্যা ১২৬ জন বলে জানা গেছে। ঐ পরিসংখ্যানে সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী পাত্র জাতিগোষ্ঠির উল্লেখ নেই, এদের সংখ্যাও স্মো জাতিগোষ্ঠির মতোই একশ'র খুব বেশী নয়। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর মধ্যে কয়েকটি জাতিগোষ্ঠি আবার এতই ছোট যে যাদের মোট জনসংখ্যা ২০০ জন অতিক্রম করছে না, এরা বিলুপ্তির প্রান্তিক অবস্থানে এসে পৌঁছে গেছে। এসব অতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি রাষ্ট্রের বিশেষ আনুকূল্য, যত্ন ও সমর্থন না পেলে অদূর ভবিষ্যতে একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সামগ্রিক অনগ্রসরতা, পশ্চাৎপদতা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ভূখন্ডে বসবাসকারী ৩০টির অধিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি সম্পর্কে ৯৮ শতাংশ বাঙালী জনগোষ্ঠির ধারণা তেমন স্বচ্ছ নয়। আমাদের অধিকাংশ মানুষই মনে করে থাকেন যে, বাংলাদেশ হচ্ছে One Nation State অর্থাৎ বাঙালী জাতিসত্তার একক রাষ্ট্র। ষাট এবং সত্তরের দশকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের তুমুল উত্থানের যুগে আশপাশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দিকে যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখা হয়নি; তখন প্রথমত ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম। উক্ত সংগ্রামে জয়লাভের ফলে বাংলাদেশ রাষ্টটিকে এককভাবে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠির করে দেখা হয়েছে, ভাবা হয়েছে। আসলে সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল বলতে গেলে এককভাবে বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে। তাছাড়া পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলো এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়া, উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা - যা ব্যাপক বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠির দৃষ্টিতে পড়তে পারে - এমন আশা করা ছিল বেশ কঠিন। তারপরও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৃহত্তর অংশই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যদিও সংগত কারণেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তাদের ভবিষ্যত মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তারা যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঘোষিত চার জাতীয় নীতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট অবস্থান থাকলেও এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের বিষয়সমূহ স্পষ্ট করে বলা হয়নি, বিবেচনায়ও আসেনি। আমাদের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও জাতিগত বিশেষ বৈচিত্র্যের এই বাংলাদেশের ৩০টির অধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এটি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে তেমনটি মনে হয় না। আসলে ছোট বড় বহুজাতিসত্তার সঙ্গে আমাদের মেলামেশা, বসবাস, দেখা-সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা কোনকালেই তেমন একটি ছিল না। আধুনিক যুগে এ বিষয়গুলো প্রায়ই বেশ জটিল ও স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারে তেমন ধারণাও আমাদের ছিল না। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে বাঙালী জাতিসত্তার একচ্ছত্র প্রভাবের ধারণা ও আবেগ থেকে আমাদের নেতৃত্ব তখন বের হতে পারেনি, স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সমস্যাটিকে ভবিষ্যতের দিকে দেখা ও বোঝা তাদের পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি। ফলে সংবিধান প্রণয়নকালে সমস্যাটির গুরুত্ব ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। অথচ ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে আমরাই মাতৃভাষা এবং জাতিসত্তার অধিকারের কথা বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিষয়টিকে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে দেখলেও ছোট ছোট জাতিসত্তার অবস্থান থেকেও দেখার রয়েছে যে, তা উপলব্ধি করতে পারিনি। ফলে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর সঙ্গে আমাদের বাঙালী নেতৃত্বের যে দূরত্ব তৈরী হয়েছিল তা এখনো পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ দফাকে গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠিই কোন না কোন ভাষার উৎপত্তিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এটি ঐ জাতির গৌরবময় অর্জন ও সম্পদও বটে। তবে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে যে, কোন ভাষা কোন একটি জনগোষ্ঠির সৃষ্টি হলেও এটি বিশ্ব পরিসরে সকল মানবজাতিরই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এটিকে অবহেলা করার কোন কারণ নেই। এক সময় নানা কারণে অসংখ্য ভাষার বিলুপ্তি ঘটেছে- যা মানবসভ্যতার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এখন চেষ্টা চলছে ছোট ছোট জাতিসত্তা এবং তাদের ভাষা সংরক্ষণ করার। আমাদের দেশেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং তাদের ভাষার বিকাশ সাধনের বিষয়গুলো ইদানীং গুরুত্বসহকারে আলোচিত হচ্ছে। আমাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর নিজস্ব মৌখিক ভাষা রয়েছে, যদিও অধিকাংশেরই লেখ্য ভাষা বা বর্ণমালা নেই। তবে প্রধান চারটি ভাষা পরিবারের সঙ্গে এগুলো জড়িত। ভাষা পরিবার চারটি হচ্ছে আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও তিব্বতী-বর্মী। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে প্রতিটি জাতিসত্তাই তাদের বর্ণমালার প্রচলনসহ মাতৃভাষার একটি আধুনিক রূপ উপস্থাপন করতে পারবে- এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, ভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, অসংখ্য ভাঙ্গা গড়ার চড়াই উৎরাই পার হয়েই ভাষা এগিয়ে চলে নিরন্তর গতিতে। সুতরাং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোন কারণ নেই। কোন জাতিসত্তাই তাদের মাতৃভাষাকে ত্যাগ করতে আগ্রহী নয়। চর্চার সুযোগ থাকলে যে কোন শিশুই মাতৃভাষাতেই লেখাপড়া করতে আগ্রহী হবে- এটিই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষা ব্যতীত শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ হয় না। সুতরাং খুব ছোট হলেও বাংলাদেশের ৩০টির অধিক জাতিগোষ্ঠির মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির দাবিটি কোনভাবেই অন্যায্য হতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে সব ভাষার বর্ণমালা নেই, ব্যাকরণ, সাহিত্যসহ অনেক কিছুই নেই তা উদ্ভাবন করা সম্ভব কিনা। এটি অসম্ভব কিছুও নয়। হয়তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ঐ জনগোষ্ঠির মেধা ও মননকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে, লাগাতে সুযোগ দেয়া হলে তা নিজস্ব নিয়মে একটি রূপ পরিগ্রহ করবেই। অন্য কোন জাতি বা জনগোষ্ঠি এ কাজটি কোনভাবেই করতে পারবে না, করা উচিতও নয়। বাংলাদেশের যেসব জাতিগোষ্ঠির মাতৃভাষার লিখিত বর্ণমালা রয়েছে তাদের বিষয়টি অনেকটা এগিয়ে আছে। কিন্তু নানা কারণেই এসব ভাষায় দেশের পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচিত না হওয়াই ঐসব জাতিগোষ্ঠির শিশু-কিশোররা লেখাপড়া করতে পারে না; শিশুদের জন্য এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও বটে। এরা ঘরে-বাইরে চাকমা, মনিপুরী, সাঁওতাল ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে, অথচ লেখাপড়া করতে চাইলেই তাদেরকে বাংলা ভাষার স্কুলে ভর্তি হতে হয়, বাংলা ভাষাতেই সবকিছু পড়তে হয়। অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠির জন্য এটি একটি মস্ত বড় বাধা এবং সংকটও বটে। বাংলাদেশের স্কুল পাঠ্যপুস্তকের মূল ধ্যান-ধারণাতেই রয়েছে ধর্মীয় এবং জাতিগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার একচ্ছত্র প্রভাব এবং আধিপত্য। এটি এসব অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠিকে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে থাকে। আমাদের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জীবন-জীবিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তেমন বাস্তবভিত্তিক রচনা সন্নিবেশিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত পরিচ্ছেদ পাঠ করে বাঙালী শিশুরা উপজাতীয়দের সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করছে তা কোনভাবে শিশুদের মনে সম্প্রীতির ভাব গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। অপরদিকে ঐসব জাতিগোষ্ঠির শিশুদের মধ্যে নিজস্ব জাতিগোষ্ঠির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণা তৈরীতে সাহায্য করছে না। বাঙালীদের ব্যতীত অন্য কোন জাতিগোষ্ঠির সাহিত্য, ইতিহাস, শৌর্য-বীর্য নিয়ে রচিত কোন কবিতা, গল্প, ইতিহাস এসব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জানি বিষয়টি বেশ জটিল এবং স্পর্শকাতর। কিন্তু ৩০টির বেশী জাতিগোষ্ঠির শিশুরা স্কুলে পড়বে, তরুণরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, নিজেদের আত্মপরিচয়ে(র) একটি শব্দও পাঠ্যপুস্তকের কোথাও খুঁজে পাবে না - তা কি খুব সহজে মেনে নেয়া যায়? আমাদের জানা মতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মনিপুরী, সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠির ব্যাপক সংখ্যক ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা হোঁচট খেয়েই যাচ্ছে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র প্রভাব ও চাপে পড়ে তাদের চিন্তাশক্তি, মেধা ও মনন যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে না, পারার কথাও নয়। আমার মনে হচ্ছে এ ধরনের একচ্ছত্র অবস্থাতে শিশু ও শিক্ষার্থীদের মনে বৈরী ও বিরূপ ভাবধারাই তৈরী হতে পারে। হ্যাঁ, যদি স্বেচ্ছায় কেউ বাংলা ভাষায় পড়তে আসে তাতে সমস্যা অনেক কম সৃষ্টি হয় কিন্তু বাধ্য হয়ে পড়তে আসলে বাঙালীদের প্রতি অশ্রদ্ধার অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ই শিশু-কিশোরদের মনে জন্ম নিতে পারে। আমার ধারণা সেটিই অবচেতনে তৈরী হচ্ছে। আমরা কেন এ ধরনের বিরূপ ধারণা তৈরী হতে সুযোগ দেবো? আসলে প্রতিটি শিশুরই মাতৃভাষা শেখা, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা এবং নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কে জানা, জ্ঞান লাভ করা আজকের দুনিয়ায় একটি স্বীকৃত বিষয়। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে মাত্র। প্রতিটি মানুষ যেন আত্মপরিচয়ের কোন দ্বন্দ্ব বা সঙ্কটে জীবন-যাপন না করে সেদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিকে সজাগ রাখতে হবে। তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশ্বাস ও আস্থার সৃষ্টি হবে, প্রতিটি মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ ঘটবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রই শেষ বিচারে লাভবান হতে পারে। এ ধরনের প্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে বাংলাদেশের অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিসমূহের ভাষা ও শিক্ষার সমস্যাকে বিবেচনা করলে, সমাধানের পথে অগ্রসর হলে আমার ধারণা বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবেই লাভবান হবে। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষেই অর্থবহ হয়ে উঠবে।

[লেখক: অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়]

সৌজন্যে দৈনিক ইত্তেফাক

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

টোকিওতে বাংলাদেশ দুতাবাসের সামনে প্রবাসী জুম্মদের বিক্ষোভ

টোকিও প্রতিনিধি॥ গত ১৮ অক্টোবর টোকিওতে বাংলাদেশ দুতাবাসের সামনে প্রবাসী জুম্মরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান সম্প্রতি উখিয়ায় চাকমাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের উখিয়ার মাদারবুনিয়া গ্রামে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য শেষ পাতা দেখুন)।

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান প্রধান মন্ত্রীর কাছে লেখা এক চিঠিতে অভিযোগ করেন যে বাংলাদেশ সরকার সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক জাপান সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন পূর্বক তাদের দ্বারা বেদখলকৃত পাহাড়িদের জায়গা জমি ফেরত দেয়ার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। তারা আশংকা প্রকাশ করে বলেন যতদিন সেটলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকবে ততদিন সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে থাকবে যেমনভাবে অতীতে হয়েছে। কারণ বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনী তাদেরকে পাহাড়ি জনগণের ওপর জাতিগত নিপীড়ন চালানোর হাতিয়ার ও একই সাথে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সমীপে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক -কোরিয়া এর স্মারকলিপি পেশ

সিউল প্রতিনিধি॥ গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক কোরিয়া নামে প্রবাসী জুম্মদের একটি সংগঠন সিউলে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট এক স্মারকলিপি পাঠিয়েছে। স্মারকলিপিতে সংগঠনটি ৭ দফা দাবি জানিয়েছে। এগুলো হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা, সমতল এলাকা থেকে বেআইনী অভিবাসন বন্ধ করার লক্ষ্যে বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত আভ্যন্তরীণ অনুমতি ব্যবস্থা (inner line permit system) চালু করা, অবিলম্বে যথাযথ ক্ষতিপূরণসহ উচ্ছেদকৃত জুম্মদের পুনর্বাসন করা, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করা ও হারানো জমি আসল জুম্ম মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের বিধান রেখে শান্তি চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিকরণ বন্ধ করা ও ক্ষুদ্রজাতিসত্তাসমূহের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, এবং মিথ্যা অভিযোগে ইউপিডিএফ কর্মিদের ওপর হয়রানি বন্ধ করা।

স্মারকলিপিতে বলা হয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন সরকার জুম্মদের নিজস্ব স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাস করার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেনি। এটা মানবাধিকার সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বিষয় হয়েছে যে, অবাস্তবায়িত চুক্তির ফলে জুম্মদের মধ্যে বিভাজন ঘটেছে এবং এতে জুম্মদের সমাজ দুর্বল হয়েছে।

স্মারকলিপিতে চুক্তির পর সংঘটিত বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিবরণ তুলে ধরে এর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে দায়ি করা হয়।

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-কোরিয়া মনে করে বাংলাদেশ সরকার ও পিসিজেএসএস এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তারই প্রমাণ।

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক কোরিয়া আশা করে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সাংবিধানিক গ্যারান্টি সহকারে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যথাযথ উদ্যোগ নেবে। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন সংগঠনটির সভাপতি শান্তি জীবন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক রনেল চাকমা।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে ডানিডা প্রতিনিধিদের সাক্ষাত

গত ৫ নভেম্বর খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে সফররত ডানিডা প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাত করেছেন। ইউপিডিএফ এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের আহ্বায়ক অনিল চাকমা ও অনিমেষ চাকমা। নেতৃবৃন্দ ডানিডা প্রতিনিধিদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

শহীদ ভরদাসমুনির ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গত ১৩ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে শহীদ ভরদাসমুনির ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সকাল সাড়ে দশটায় শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পনের পর বেলা ১১টায় নারাঙহিয়া রেডস্কোয়ার থেকে শুরু হয়। মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে শাপলা চত্বর ঘুরে স্বনির্ভর মাঠে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক ও জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভানেত্রী স্বর্ণা চাকমা, পিসিপি ঢাকা শাখার নেতা অনুতোষ চাকমা, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বরূপম চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক স্বর্ণজ্যোতি চাকমা।

বক্তারা শহীদ ভরদাস মুনি হত্যার এক দশক পূর্ণ হলেও দোষী ব্যক্তিদের বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এ হত্যাকান্ডসহ এ যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা সাম্প্রতিক সময়ে অপারেশন "উত্তরণ" নামে সেনা এবং পুলিশী অভিযানে সাধারণ নিরীহ জনগণকে হয়রানির অভিযোগ করেন। তিনি সন্ত্রাস বন্ধ করতে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি সম্প্রতি বান্দরবানে কথিত এক বাঙালী নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে পাহাড়ি গ্রামে হামলা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে তার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি অবিলম্বে ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

অনিমেষ চাকমা বলেন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রশ্রয় না দিয়ে মেধা, যোগ্যতা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগদান করতে হবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণ করা এবং বহিরাগত অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী গত ৫ অক্টোবর দীঘিনালার বাবুছড়ায় এক বাঙালি কর্তৃক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অপচেষ্টার নিন্দা জানিয়ে দোষী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। পিসিপি নেতৃবৃন্দ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পার্বত্য কোটা বাতিল করে পাহাড়ি কোটা চালু করা এবং সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট পেশ করা শিক্ষাসংক্রান্ত ৫ দফা দাবি পূরণের দাবি জানান।

উল্লেখ, ৭০ বছরের বৃদ্ধ শহীদ ভরদাসমুনি ১৯৯৩ সালের ১৩ অক্টোবর দিঘীনালায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য আসার পথে বহিরাগতদের হামলার শিকার হন।

পিসিপি মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার উদ্যোগে নবীন ছাত্রছাত্রীদের সাথে মত বিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

দীপংকর ত্রিপুরা॥ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ মাটিরাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দুপুর ১২:৩০টায় পিসিপি মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার উদ্যোগে নবীদের সাথে এক মত বিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শাখার সভাপতি কল্যাণ মিত্র দেওয়ান। এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রিপন চাকমা, সন্তোষ চাকমা, দীপংকর ত্রিপুরা, সর্বোত্তম চাকমা ও এইচডব্লিউএফ-এর মিংকু চাকমা বক্তব্য রাখেন। কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক কেসিং মারমা সভা পরিচালনা করেন।

বক্তারা পিসিপি'র গঠনের পটভূমি, সংগ্রামের ঐতিহ্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসার জন্য নবীনদের প্রতি আহ্বান জানান। সমাজ ও জাতির প্রতি ছাত্রসমাজের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারহারা জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পিসিপি ও ছাত্রসমাজের তার ইতিহাস নির্ধারিত ভূমিকা অবশ্যই পালন করতে হবে।

কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় চাকমা গ্রামে হামলা তদন্ত: পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর সংবাদ সম্মেলন

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ১২-১৩ অক্টোবর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কক্সবাজারের উখিয়ায় এক চাকমা গ্রামে সন্ত্রাসী হামলার তদন্ত করতে যায়। সেখান থেকে ফিরে তারা চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য ও বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ সাংবাদিকদের কাছে পরিবেশন করা হয়। নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে কিছু দাবিও তুলে ধরেন। এগুলো হলো ১. নারী ও শিশু নির্যাতন ও লুটপাটকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দেয়া এজাহারভুক্ত আসামীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। ২. অবিলম্বে সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদান করে স্থানীয় চাকমাদের স্ব-ভূমিতে টিকে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. অবিলম্বে আব্দুল্লাহ হত্যার ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত খুনীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। ৪. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। ৫. কক্সবাজার জেলায় বসবাসরত সকল জাতিসত্তার শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, "ধারাবাহিক সন্ত্রাসে জিম্মি হয়ে আছে উখিয়া থানার পাহাড়ি গ্রামবাসীরা। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২ মাদারবুনিয়া গ্রামে সংঘটিত ঘটনাটিও ধারাবাহিক সন্ত্রাসের একটি অংশ।"

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বলেন, যে তথাকথিত বিরোধপূর্ণ জমিকে কেন্দ্র করে হামলার সূত্রপাত সেখানে চাকমাদের একটি পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির ছিল। ১৯৯৪ সালের ঘুর্নিঝড়ে মন্দিরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলে গ্রামের মাঝখানে অস্থায়ীভাবে মন্দির তৈরী করে তারা নিজেদের ধর্মীয় বিধান মতে পূজা পার্বণ করে থাকে। এরপর থেকে বিভিন্ন সময় স্থানীয় সন্ত্রাসীরা জায়গাটি বেদখলের পাঁয়তারা চালায়। সন্ত্রাসীরা জায়গাটি বেদখলের উদ্দেশ্যে কখনো খেলার মাঠ আবার কখনো ক্লাব ঘরের জায়গা হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দাবি করে। চাকমারা এর প্রতিবাদে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। থানা প্রশাসন উক্ত জায়গাটি চাকমাদের বলে মৌখিক নির্দেশ দেয়। কিন্তু এরপরও জায়গাটি বেদখলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এ অবস্থায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম ওরফে ঠাণ্ডা মিঞার কাছে প্রতিকার চাওয়া হয়। তিনিও জায়গাটি চাকমাদের বলে জানিয়ে দেন। তা সত্বেও সন্ত্রাসীরা জায়গাটি বেদখল করার জন্য নানাভাবে তৎপরতা চালাতে থাকে।

১১ সেপ্টেম্বর হামলার দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, সেদিন বুধবার গ্রামবাসীরা পুরাতন মন্দিরের জায়গায় নতুন করে মন্দির নির্মাণের জন্য খুঁটির গর্ত খুড়ছিলেন। এ সময় সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে সন্ত্রাসীরা উক্ত জায়গাটি বেদখলের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র হামলা চালায়। আব্দুল্লাহ নামে এক বাঙালী চাকমাদের পক্ষ হয়ে হামলাকারীদের বাধা দিতে গেলে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। সন্ত্রাসীরা দা দিয়ে তার মাথায় কুপিয়ে আঘাত করে। এরপর সন্ত্রাসীরা চাকমাদের গ্রামে প্রবেশ করে লোকজনকে নির্বিচারে মারধর করে, বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুর করে এবং গ্রামের মহিলাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শ্লীলতাহানি করে। এ হামলায় ৪০/৫০ জন গ্রামবাসী আহত হন। এদের মধ্যে ৮ জনকে সন্ত্রাসীরা মুসলিম পাড়ায় নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। সন্ত্রাসীরা মৃত অবস্থায় আব্দুল্লাহর লাশ চাকমাদের গ্রামে একটি বাড়ির উঠোনে ফেলে রেখে যায়। এলাকাবাসীদের ভাষ্য মতে, আব্দুল্লাহর সাথে চাকমাদের অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল।

ঘটনার পর পর কয়েকজন চাকমা জংগল দিয়ে পালিয়ে এসে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাত ৮টার দিকে মৃত আব্দুল্লাহর লাশ উদ্ধার করে এবং বাঙালীদের পাড়ায় আটকিয়ে রাখা ৮ জন চাকমাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ত্রাসীরা ২২ জনকে আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করে যার মধ্যে আটককৃত ঐ আট জনও রয়েছেন। বাকীরা গ্রেফতার এড়াতে অন্য পাহাড়ি গ্রামে পালিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত চাকমাদের পক্ষ থেকেও পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়। একটি দায়ের করেন চ্যানিও চাকমা। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের অধীনে ১০ জনকে আসামী করে কক্সবাজার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তিনি এই মামলা দায়ের করেন। অপর মামলাটি দায়ের করেন ক্যাজাইঅং মারমা। তিনি ১২ জনকে আসামী করে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মামলা দায়ের করেন। প্রশাসন এখনো পর্যন্ত এই দুই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

উক্ত হামলায় যারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তদন্ত দলের সদস্যরা তাদের ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা দেন। তারা মোট ১৯ জন চাকমা গ্রামবাসী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন।

তদন্ত দলের সদস্যরা আরো বলেন, মুছার খোলা, হরিখোলা, মনখালি ইত্যাদি গ্রামের পরিস্থিতিও মাদারবুনিয়া গ্রামের চিত্রের চাইতে ভিন্ন নয়। এসব গ্রামেও চাকমাদের জায়গাজমি প্রতিনিয়ত বেদখল করা হয়ে থাকে। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ দেয়া হয়। বাঙালীরা প্রায়ই চাকমাদের বাড়ির উঠোনের ক্ষেত থেকে লাউ, আলু, কচু ইত্যাদি জোর করে নিয়ে যায়। জুম ক্ষেত থেকে নিয়ে যায় নানান শাকসবজী। যুবতি মেয়েরা ভয়ে বাজারে যেতে পারে না। তাদের সাথে অশালীন আচরণ ও মন্তব্য করা হয়। এমনকি গ্রামের পুরুষরাও একলা বাজারে গিয়ে সওদা করতে কিংবা জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারে না। ছোটো ছেলেমেয়েরা নিকটস্থ প্রাইমারী স্কুলে যেতে পারছে না। স্কুলে আসা যাওয়ার পথে তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। ফলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ধর্মীয় পুরোহিতরাও তাদের আগ্রাসী হামলা থেকে বাদ যান না। মুছার খোলার বৌদ্ধ বিহারের ভান্তেকে বাজার থেকে ফেরার পথে বিনা কারণে মারধর করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার দিনেও বৌদ্ধ বিহারে ঢুকে ভান্তেকে কানে ধরে টেনে হিঁচড়ে উঠোনে নিয়ে আসা হয়। বুদ্ধের মূর্তি ভেঙে দেয়া হয়। স্থানীয় বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে পূজা পার্বণে লোক জমায়েত হলে মাইকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাদেরকে মাইক ব্যবহার করতে বাধা দেয়া হয়। মুছার খোলা, মাদারবুনিয়ার লোকজনকে প্রায়ই বাঙালীরা হুমকি দিয়ে বলে যে, "এ দেশ তোমাদের নয়, এখানে তোমরা থাকতে পারবে না। তোমরা বার্মায় চলে যাও। ওখানে তোমাদের মতো লোক আছে। চলে না গেলে তোমাদের ঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে।" ফলে উখিয়ায় চাকমা গ্রামের লোকজনকে সব সময় আতংকে দিন যাপন করতে হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সোনালী চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সর্বোত্তম চাকমা, দীপংকর ত্রিপুরা, চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা, অলকেশ চাকমা, মংগল বাঁশী চাকমা, রূপায়ন চাকমা, দেবাশীষ চাকমা, বকুল কান্তি চাকমা, অন্তরিকা চাকমা, অপু চাকমা, সমারী চাকমা প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে পিসিপি'র স্মারকলিপি পেশ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ১৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষা সম্পর্কিত পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক রূপন চাকমার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে দেখা করে এই স্মারকলিপি পেশ করে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন অনুতোষ চাকমা, রুইসা অং মারমা ও নূসেন বম। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ধৈর্য্য সহকারে পিসিপি নেতাদের বক্তব্য শোনেন এবং তাদের দাবি পুরণের আশ্বাস প্রদান করেন। পাঁচ দফা দাবিগুলো হলো ১. পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, ২. জাতিসত্তার প্রতি অবমাননাকর যে কোন বক্তব্য পাঠ্য পুস্তক থেকে বাদ দিতে হবে, ৩. পাহাড়ি জাতিসত্তার সঠিক ও সংগ্রামী রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত পুস্তক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, ৪. বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত সঠিক তথ্য সম্বলিত পরিচিতিমূলক পুস্তক বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, ৫. পার্বত্য কোটা বাতিল করে পাহাড়ি কোটা চালু করতে হবে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, বাংলাদেশে বাঙলা ভাষী ছাড়াও ভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতিসত্তার বাস। তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নেয়ার মৌলিক অধিকার রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের জনগণও জানেন না বহু জাতিসত্তার দেশ। তাই জাতীয় শিক্ষাক্রমে পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তাসমূহের পরিচিতি তুলে ধরা হলে বাংলাদেশের জনগণ এ সম্পর্কে সচেতন হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।"

এর আগে সংগঠনটি সকালে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে মিছিল ও সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, অনুতোষ চাকমা, রুইসা অং মারমা, পিন্টু চাকমা, প্রুচিং থোয়াই মারমা ও মিন্টু চাকমা। পাঁচ দফা দাবিনামার সাথে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মৃদুল কান্তি দাশ।

রূপক চাকমা স্মরণে শোক র‍্যালি ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

রূপন চাকমা ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ভ্যানগার্ড পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি রূপক চাকমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২১শে সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে এক শোক র‍্যালি ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর আয়োজন করে। সকালে খাগড়াছড়ি সদর এলাকার নারাঙহিয়া রেড স্কোয়ার থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে তা চেঙ্গী স্কোয়ার ও শাপলা চত্বর ঘুরে আবার রেড স্কোয়ারে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে স্থানীয় জনগণ ও সংগঠনের নেতা কর্মিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশ প্রথমে র‍্যালিটি শাপলা চত্বরে যেতে বাধা দেয়, কিন্তু মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্র জনতার চাপের মুখে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এরপর দুপুর নাগাদ রেড স্কোয়ারে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ নেতা অনিল চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহসাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার চাকমা, ইউপিডিএফ নেতা প্রদীপন খীসা ও অনিমেষ চাকমা।

বক্তারা রূপক চাকমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগঠনে তার অবদানের কথা স্মরণ করেন। তারা জেএসএস এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সমালোচনা করে বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও ইউপিডিএফ এর একনিষ্ঠ কর্মি রূপক চাকমাকে পর্যন্ত তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বলি হতে হলো। বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সরকারী প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সব সময়ই জেএসএস এর এসব সন্ত্রাসী কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে। এমনকি রূপক চাকমার হত্যাকরীরা তাদের নাকের ডগায় ঘোরাফেরা করলেও তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। তারা অবিলম্বে জেএসএস এর সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

র‍্যালি শুরুর আগে রূপক চাকমার প্রতীকি স্মৃতিস্তম্ভের বেদীমূলে রূপক চাকমার পরিবারসহ ইউপিডিএফ, পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ এর পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়। এ সময় দেয়া বক্তব্যে শহীদ রূপক চাকমার মা তার পুত্র হত্যার বিচার দাবি করেন।

উল্লেখ্য, রূপক চাকমা গত বছর ২১ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ এর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় পুজগাঙে জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যদের গুলিতে প্রাণ হারান। জেএসএস তথাকথিত নির্বাচন প্রতিহত করার নামে সে সময় ইউপিডিএফ এর ৫ জন কর্মি ও সমর্থককে খুন করে। তাদের এই নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার কর্মসূচী এক হাস্যকর ও একই সাথে বেদনাদায়ক প্রহসনে পরিণত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীর কাছে পিসিপি'র স্মারকলিপি পেশ

গত ১১ সেপ্টেম্বর পিসিপির একটি প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীর নিকট শিক্ষা সম্পর্কিত ৫ দফা দাবি উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ৭ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন মিঠুন চাকমা, সুপার জ্যোতি চাকমা, রূপন চাকমা, অনুতোষ চাকমা, রুইসা অং মারমা, শৌভিক চাকমা ও মলিনা চাকমা।

মন্ত্রী প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনেন এবং বিষয়টি তিনি শিক্ষা মন্ত্রীর নজরে নিয়ে আসবেন বলে আশ্বাস দেন।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা